নৌকাডুবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐতিহ্য

সূচনা

পাঠক যে ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে যে, নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ কাজ করা অসম্ভব— এইজন্য নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না। প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এ-সব কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদ। উৎসটা গভীর ভিতরে, গোমুখী তো উৎস নয়। প্রকাশকের ফরমাশকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে-বসা আর প্রকাশকে পেয়ে-বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলা বাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্প লেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি। সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল— অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন। ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ— তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না। কেবল বলব গল্পের মধ্যে যে অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে তা হলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এও অসংকোচে বলতে পারি নে, কেননা রুচির দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।

অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নৌকাডুবি

রমেশ এবার আইন-পরীক্ষায় যে পাস হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন— স্কলারশিপও কখনো ফাঁক যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ি যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিতা শীঘ্র বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে বাড়ি যাইবে।

অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের সহাধ্যায়ী। পাশের বাড়িতেই সে থাকে। অন্নদাবাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার কন্যা হেমনলিনী এবার এফ. এ. দিয়াছে। রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ি চা খাইতে এবং চা না খাইতেও প্রায়ই যাইত।

হেমনলিনী স্নানের পর চুল শুকাইতে শুকাইতে ছাদে বেড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিত। রমেশও সেই সময়ে বাসার নির্জন ছাদে চিলেকোঠার এক পাশে বই লইয়া বসিত। অধ্যয়নের পক্ষে এরূপ স্থান অনুকূল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিস্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর মনে মনে লক্ষ আছে।

সেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক উঠিয়াছিল। অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে বেচারার চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষা পাস-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। সে তর্ক তুলিয়াছিল যে পুরুষের বুদ্ধি খক্ষের মতো, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ করিতে পারে; মেয়েদের বুদ্ধি কলম-কাটা ছুরির মতো, যতই ধার দাও-না কেন, তাহাতে কোনো বৃহৎ কাজ চলে না— ইত্যাদি। হেমনলিনী অক্ষয়ের এই প্রগল্‌ভতা নীরবে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধিকে খাটো করিবার পক্ষে তাহার ভাই যোগেন্দ্রও যুক্তি আনয়ন করিল। তখন রমেশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া স্ত্রীজাতির স্তবগান করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছ্বসিত উৎসাহে অন্য দিনের চেয়ে দু-পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় বেহারা তাহার হাতে এক-টুকরা চিঠি দিল। বহির্ভাগে তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা। চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কী?" রমেশ কহিল, "বাবা দেশ হইতে আসিয়াছেন।" হেমনলিনী যোগেন্দ্রকে কহিল, "দাদা, রমেশবাবুর বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আনো-না কেন, এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে।"

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না, আজ থাক্, আমি যাই।"

অক্ষয় মনে মনে খুশি হইয়া বলিয়া লইল, "এখানে খাইতে তাঁহার হয়তো আপত্তি হইতে পারে।"

রমেশের পিতা ব্রজমোহনবাবু রমেশকে কহিলেন, "কাল সকালের গাড়িতেই তোমাকে দেশে যাইতে হইবে।"

রমেশ মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিশেষ কোনো কাজ আছে কি?"

ব্রজমোহন কহিলেন, "এমন কিছু গুরুতর নহে।"

তবে এত তাগিদ কেন, সেটুকু শুনিবার জন্য রমেশ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কৌতূহল-নিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

ব্রজমোহনবাবু সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলেন, তখন রমেশ তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে বসিল। 'শ্রীচরণকমলেষু' পর্যন্ত লিখিয়া লেখা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কিন্তু রমেশ মনে মনে কহিল, 'আমি হেমনলিনী সম্বন্ধে যে অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বাবার কাছে আর তাহা গোপন করা কোনোমতেই উচিত হইবে না।' অনেকগুলা চিঠি অনেক রকম করিয়া লিখিল— সমস্তই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ব্রজমোহন আহার করিয়া আরামে নিদ্রা দিলেন। রমেশ বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে তাকাইয়া নিশাচরের মতো সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার সময় অক্ষয় অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল— রাত্রি সাড়ে-নয়টার সময় রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ হইল— রাত্রি দশটার সময় অন্নদাবাবুর বসিবার ঘরের আলো নিবিল, রাত্রি সাড়ে-দশটার পর সে-বাড়ির কক্ষে কক্ষে সুগভীর সুষুপ্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরের ট্রেনে রমেশকে রওনা হইতে হইল। ব্রজমোহনবাবুর সতর্কতায় গাড়ি ফেল করিবার কোনোই সুযোগ উপস্থিত হইল না।

২

বাড়ি গিয়া রমেশ খবর পাইল, তাহার বিবাহের পাত্রী ও দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পিতা ব্রজমোহনের বাল্যবন্ধু ঈশান যখন ওকালতি করিতেন, তখন ব্রজমোহনের অবস্থা ভালো ছিল না— ঈশানের সহায়তাতেই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন। সেই ঈশান যখন অকালে মারা পড়িলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঞ্চয় কিছুই নাই, দেনা আছে। বিধবা স্ত্রী একটি শিশুকন্যাকে লইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। সেই কন্যাটি আজ বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, ব্রজমোহন তাহারই সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। রমেশের হিতৈষীরা কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, শুনিয়াছি মেয়েটি দেখিতে তেমন ভালো নয়। ব্রজমোহন কহিলেন, "ও-সকল কথা আমি ভালো বুঝি না— মানুষ তো ফুল কিংবা প্রজাপতি মাত্র নয় যে, ভালো দেখার বিচারটাই সর্বাগ্রে তুলিতে হইবে। মেয়েটির মা যেমন সতী-সাধ্বী, মেয়েটিও যদি তেমনি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে।"

শুভবিবাহের জনশ্রুতিতে রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উদাসের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিষ্কৃতিলাভের নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিয়া কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শেষকালে বহুকষ্টে সংকোচ দূর করিয়া পিতাকে গিয়া কহিল, "বাবা, এ বিবাহ আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি অন্য স্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি।"

ব্রজমোহন। বল কী! একেবারে পানপত্র হইয়া গেল?

রমেশ। না, ঠিক পানপত্র নয়, তবে—

ব্রজমোহন। কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হইয়া গেছে?

রমেশ। না, কথাবার্তা যাহাকে বলে তাহা হয় নাই—

ব্রজমোহন। হয় নাই তো! তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর ক'টা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে।

রমেশ একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, "আর কোনো কন্যাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে।"

ব্রজমোহন কহিলেন, "না-করা তোমার পক্ষে আরো বেশি অন্যায় হইতে পারে।"

রমেশ আর কিছু বলিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, ইতিমধ্যে দৈবক্রমে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইতে পারে।

রমেশের বিবাহের যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহার পরে এক বৎসর অকাল ছিল—সে ভাবিয়াছিল, কোনোক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার এক বৎসর মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।

কন্যার বাড়ি নদীপথ দিয়া যাইতে হইবে— নিতান্ত কাছে নহে— ছোটো-বড়ো দুটো-তিনটে নদী উত্তীর্ণ হইতে তিন-চার দিন লাগিবার কথা। ব্রজমোহন দৈবের জন্য যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া এক সপ্তাহ পূর্বে শুভদিনে যাত্রা করিলেন।

বরাবর বাতাস অনুকূল ছিল। শিমুলঘাটায় পৌঁছিতে পুরা তিন দিনও লাগিল না। বিবাহের এখনো চার দিন দেরি আছে।

ব্রজমোহনবাবুর দু-চার দিন আগে আসিবারই ইচ্ছা ছিল। শিমুলঘাটায় তাঁহার বেহান দীন অবস্থায় থাকেন। ব্রজমোহনবাবুর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, ইঁহার বাসস্থান তাঁহাদের স্বগ্রামে উঠাইয়া লইয়া ইঁহাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখেন ও বন্ধুঋণ শোধ করেন। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকাতে হঠাৎ সে প্রস্তাব করা সংগত মনে করেন নাই। এবারে বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার বেহানকে তিনি বাস উঠাইয়া লইতে রাজি করাইয়াছেন। সংসারে বেহানের একটিমাত্র কন্যা— তাহার কাছে থাকিয়া মাতৃহীন জামাতার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহাতে তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "যে যাহা বলে বলুক, যেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকিবে সেখানেই আমার স্থান।"

বিবাহের কিছুদিন আগে আসিয়া ব্রজমোহনবাবু তাঁহার বেহানের ঘরকন্না তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহের পর সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করাই তাঁহার ইচ্ছা। এইজন্য তিনি বাড়ি হইতে আত্মীয় স্ত্রীলোক কয়েকজনকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন।

বিবাহকালে রমেশ ঠিকমত মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল, বাসরঘরের হাস্যোৎপাত নীরবে নতমুখে সহ্য করিল, রাত্রে শয্যাপ্রান্তে পাশ ফিরিয়া রহিল, প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিবাহ সম্পন্ন হইলে মেয়েরা এক নৌকায়, বৃদ্ধেরা এক নৌকায়, বর ও বয়স্যগণ আর-এক নৌকায় যাত্রা করিল। অন্য এক নৌকায়, রোশনচৌকির দল যখন-তখন যে-সে রাগিণী যেমন-তেমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন অসহ্য গরম। আকাশে মেঘ নাই, অথচ একটা বিবর্ণ আচ্ছাদনে চারি দিক ঢাকা পড়িয়াছে— তীরের তরুশ্রেণী পাংশুবর্ণ। গাছের পাতা নড়িতেছে না। দাঁড়িমাঝিরা গলদ্‌ঘর্ম। সন্ধ্যার অন্ধকার জমিবার পূর্বেই মাল্লারা কহিল, "কর্তা, নৌকা এইবার ঘাটে বাঁধি—সম্মুখে অনেক দূর আর নৌকা রাখিবার জায়গা নাই।" ব্রজমোহনবাবু পথে বিলম্ব করিতে চান না। তিনি কহিলেন, "এখানে বাঁধিলে চলিবে না। আজ প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না আছে, আজ বালুহাটায় পৌঁছিয়া নৌকা বাঁধিব। তোরা বকশিশ পাইবি।"

নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। এক দিকে চর ধূ ধূ করিতেছে, আর-এক দিকে ভাঙা উচ্চ পাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্ষুর মতো অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।

এমন সময় আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধুলাবালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। 'রাখ্ রাখ্, সামাল সামাল, হায় হায়' করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কী হইল কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি সংকীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কী করিল তাহার কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

৩

কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রমেশ দেখিল, সে বালির তটে পড়িয়া আছে। কী ঘটিয়াছিল, তাহা মনে করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় গেল— তাহার পরে দুঃস্বপ্নের মতো সমস্ত ঘটনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের কী দশা হইল সন্ধান করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই। বালুতটের তীর বাহিয়া সে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল।

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো ঊর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছে। রমেশ যখন একটি শাখার তীরপ্রান্ত ঘুরিয়া অন্য শাখার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন কিছুদূরে একটা লাল কাপড়ের মতো দেখা গেল। দ্রুতপদে কাছে আসিয়া রমেশ দেখিল, লাল-চেলি-পরা নববধূটি প্রাণহীনভাবে পড়িয়া আছে।

জলমগ্ন মুমূর্ষুর শ্বাসক্রিয়া কিরূপ কৃত্রিম উপায়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, রমেশ তাহা জানিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া রমেশ বালিকার বাহুদুটি একবার তাহার শিয়রের দিকে প্রসারিত করিয়া পরক্ষণেই তাহার পেটের উপর চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বধূর নিশ্বাস বহিল এবং সে চক্ষু মেলিল।

রমেশ তখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকাকে কোনো প্রশ্ন করিবে, সেটুকু শ্বাসও যেন তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

বালিকা তখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে নাই। একবার চোখ মেলিয়া তখনই তাহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। রমেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার শ্বাসক্রিয়ার আর কোনো ব্যাঘাত নাই। তখন এই জনহীন জলস্থলের সীমায় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সেই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে রমেশ বালিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

কে বলিল সুশীলাকে ভালো দেখিতে নয়? এই নিমীলিতনেত্র সুকুমার মুখখানি ছোটো— তবু এতবড়ো আকাশের মাঝখানে, বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্নায়, কেবল এই সুন্দর কোমল মুখ একটিমাত্র দেখিবার জিনিসের মতো গৌরবে ফুটিয়া আছে।

রমেশ আর-সকল কথা ভুলিয়া ভাবিল, 'ইহাকে যে বিবাহসভায় কলরব ও জনতার মধ্যে দেখি নাই, সে ভালোই হইয়াছে। ইহাকে এমন করিয়া আর কোথাও দেখিতে পাইতাম না। ইহার মধ্যে নিশ্বাস সঞ্চার করিয়া বিবাহের মন্ত্রপাঠের চেয়ে ইহাকে অধিক আপনার করিয়া লইয়াছি। মন্ত্র পড়িয়া ইহাকে আপনার নিশ্চিত প্রাপ্যস্বরূপ পাইতাম, এখানে ইহাকে অনুকূল বিধাতার প্রসাদের স্বরূপ লাভ করিলাম।'

জ্ঞানলাভ করিয়া বধূ উঠিয়া বসিয়া শিথিল বস্ত্র সারিয়া লইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নৌকার আর-সকলে কোথায় গেছেন, কিছু জান?"

সে কেবল নীরবে মাথা নাড়িল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এইখানে একটুখানি বসিতে পারিবে? আমি একবার চারি দিক ঘুরিয়া সকলের সন্ধান লইয়া আসিব।"

বালিকা তাহার কোনো উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার সর্বশরীর যেন সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'এখানে আমাকে একলা ফেলিয়া যাইয়ো না।'

রমেশ তাহা বুঝিতে পারিল। সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিকে তাকাইল—সাদা বালির মধ্যে কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র নাই। আত্মীয়দিগকে আহ্বান করিয়া প্রাণপণ ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, কাহারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রমেশ বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া দেখিল— বধূ মুখে দুই হাত দিয়া কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। রমেশ সান্ত্বনার কোনো কথা না বলিয়া বালিকার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায়

পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার কান্না আর চাপা রহিল না— অব্যক্তকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রমেশের দুই চক্ষু দিয়াও জলধারা ঝরিয়া পড়িল।

শ্রান্ত হৃদয় যখন রোদন বন্ধ করিল, তখন চন্দ্র অস্ত গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিস্ফুট শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

তখন রমেশ বালিকার ভয়শীতল কোমল ক্ষুদ্র দুইটি হাত দুই হাতে তুলিয়া লইয়া বধূকে আপনার দিকে ধীরে আকর্ষণ করিল। শঙ্কিত বালিকা কোনো বাধা দিল না। মানুষকে কাছে অনুভব করিবার জন্য সে তখন ব্যাকুল। অটল অন্ধকারের মধ্যে নিশ্বাসস্পন্দিত রমেশের বক্ষপটে আশ্রয় লাভ করিয়া সে আরাম বোধ করিল। তখন তাহার লজ্জা করিবার সময় নহে। রমেশের দুই বাহুর মধ্যে সে আপনি নিবিড় আগ্রহের সহিত আপনার স্থান করিয়া লইল।

প্রত্যুষের শুকতারা যখন অস্ত যায়-যায়, পূর্ব দিকের নীল নদীরেখার উপরে প্রথমে আকাশ যখন পাণ্ডুবর্ণ ও ক্রমশ রক্তিম হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল নিদ্রাবিহ্বল রমেশ বালির উপরে শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার বুকের কাছে বাহুতে মাথা রাখিয়া নববধূ সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন। অবশেষে প্রভাতের মৃদু রৌদ্র যখন উভয়ের চক্ষুপুট স্পর্শ করিল, তখন উভয়ে শশব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিল। বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য চারি দিকে চাহিল; তাহার পরে হঠাৎ মনে পড়িল যে, তাহারা ঘরে নাই, মনে পড়িল তাহারা ভাসিয়া আসিয়াছে।

৪

সকালবেলায় জেলেডিঙির সাদা-সাদা পালে নদী খচিত হইয়া উঠিল। রমেশ তাহারই একটিকে ডাকাডাকি করিয়া লইয়া জেলেদের সাহায্যে একখানি বড়ো পানসি ভাড়া করিল এবং নিরুদ্দেশ আত্মীয়দের সন্ধানের জন্য পুলিস নিযুক্ত করিয়া বধূকে লইয়া গৃহে রওনা হইল।

গ্রামের ঘাটের কাছে নৌকা পৌঁছিতেই রমেশ খবর পাইল যে, তাহার পিতার, শাশুড়ির ও আর-কয়েকটি আত্মীয়-বন্ধুর মৃতদেহ নদী হইতে পুলিস উদ্ধার করিয়াছে। জনকয়েক মাল্লা ছাড়া আর-যে কেহ বাঁচিয়াছে, এমন আশা আর কাহারও রহিল না।

বাড়িতে রমেশের বৃদ্ধা ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি বধূসহ রমেশকে ফিরিতে দেখিয়া উচ্চকলরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার যে-সকল বরযাত্র গিয়াছিল,

তাহাদেরও ঘরে ঘরে কান্না পড়িয়া গেল। শাঁক বাজিল না, হুলুধ্বনি হইল না, কেহ বধূকে বরণ করিয়া লইল না, কেহ তাহার দিকে তাকাইল না মাত্র।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইবার পরেই রমেশ বধূকে লইয়া অন্যত্র যাইবে স্থির করিয়াছিল—কিন্তু পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহার শীঘ্র নড়িবার জো ছিল না। পরিবারের শোকাতুর স্ত্রীলোকগণ তীর্থবাসের জন্য তাহাকে ধরিয়া পড়িয়াছে তাহারও বিধান করিতে হইবে।

এই-সকল কাজকর্মের অবকাশকালে রমেশ প্রণয়চর্চায় অমনোযোগী ছিল না। যদিও পূর্বে যেমন শুনা গিয়াছিল, বধূ তেমন নিতান্ত বালিকা নয়, এমন-কি, গ্রামের মেয়েরা ইহাকে অধিকবয়স্কা বলিয়া ধিক্কার দিতেছিল, তবু ইহার সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি. এ. পাস-করা ছেলেটি তাহার কোনো পুঁথির মধ্যে সে উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসংগত বলিয়াই জানিত। তবু কোনো বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোটো মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই উপায়ে তাহার স্ত্রী একই কালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতা রূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ সম্পূর্ণ সুন্দররূপে কল্পনা করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আদরে লালন করিতে থাকে, রমেশ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালিকাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া ভাবী প্রেয়সীকে কল্যাণীকে পূর্ণমহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।

৫

এইরূপে প্রায় তিন মাস অতীত হইয়া গেল। বৈষয়িক ব্যবস্থা সমস্ত সমাধা হইয়া আসিল। প্রাচীনারা তীর্থবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশীমহল হইতে দুই-একটি সঙ্গিনী নববধূর সহিত পরিচয়স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। রমেশের সঙ্গে বালিকার প্রণয়ের প্রথম গ্রন্থি অল্পে অল্পে আঁট হইয়া আসিল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ছাদে খোলা আকাশের তলে দুজনে মাদুর পাতিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমেশ পিছন হইতে হঠাৎ বালিকার চোখ টিপিয়া ধরে, তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনে, বধূ যখন রাত্রি অধিক না হইতেই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, রমেশ তখন নানাবিধ উপদ্রবে তাহাকে সচেতন করিয়া তাহার বিরক্তি-তিরস্কার লাভ করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় রমেশ বালিকার খোঁপা ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "সুশীলা, আজ তোমার চুলবাঁধা ভালো হয় নাই।"

বালিকা বলিয়া বসিল, "আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?"

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বধূ কহিল, "আমার নাম বদল হইলেই কি আমার পয় ফিরিবে? আমি তো শিশুকাল হইতেই অপয়মন্ত— না মরিলে আমার অলক্ষণ ঘুচিবে না।"

হঠাৎ রমেশের বুক ধক্ করিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল— কোথায় কী-একটা প্রমাদ ঘটিয়াছে, এ সংশয় হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "শিশুকাল হইতেই তুমি অপয়মন্ত কিসে হইলে?"

বধূ কহিল, "আমার জন্মের পূর্বেই আমার বাবা মরিয়াছেন, আমাকে জন্মদান করিয়া তাহার ছয় মাসের মধ্যে আমার মা মারা গেছেন। মামার বাড়িতে অনেক কষ্টে ছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম, কোথা হইতে আসিয়া তুমি আমাকে পছন্দ করিলে— দুই দিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল, তার পরে দেখো, কী সব বিপদই ঘটিল।"

রমেশ নিশ্চল হইয়া তাকিয়ার উপরে শুইয়া পড়িল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার জ্যোৎস্না কালি হইয়া গেল। রমেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভয় হইতে লাগিল। যতটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে, সেটুকুকে সে প্রলাপ বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া সুদূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মতো গ্রীষ্মের দক্ষিণ-হাওয়া বহিতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে নিদ্রাহীন কোকিল ডাকিতেছে— অদূরে নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার ছাদ হইতে মাঝিদের গান আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া না পাইয়া বধূ অতি ধীরে ধীরে রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, "ঘুমাইতেছ?"

রমেশ কহিল, "না।"

তাহার পরেও অনেকক্ষণ রমেশের আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বধূ কখন আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। রমেশ উঠিয়া বসিয়া তাহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিধাতা ইহার ললাটে যে গুপ্তলিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজও এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই। এমন সৌন্দর্যের ভিতরে সেই ভীষণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে।

৬

বালিকা যে রমেশের পরিণীতা স্ত্রী নহে এ কথা রমেশ বুঝিল, কিন্তু সে যে কাহার স্ত্রী তাহা বাহির করা সহজ হইল না। রমেশ তাহাকে কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহের সময় তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিলে, তখন তোমার কী মনে হইল?"

বালিকা কহিল, "আমি তো তোমাকে দেখি নাই, আমি চোখ নিচু করিয়া ছিলাম।"

রমেশ। তুমি আমার নামও শুন নাই?

বালিকা। যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল— তোমার নাম আমি শুনিই নাই। মামী আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাঁচিয়াছেন।

রমেশ। আচ্ছা, তুমি যে লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছ, তোমার নিজের নাম বানান করিয়া লেখো দেখি।

রমেশ তাহাকে একটু কাগজ, একটা পেনসিল দিল। সে বলিল, "তা বুঝি আমি আর পারি না! আমার নাম বানান করা খুব সহজ।"— বলিয়া বড়ো বড়ো অক্ষরে নিজের নাম লিখিল—শ্রীমতী কমলা দেবী।

রমেশ। আচ্ছা, মামার নাম লেখো।

কমলা লিখিল— শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও ভুল হইয়াছে?"

রমেশ কহিল, "না। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের নাম লেখো দেখি।"

সে লিখিল— ধোবাপুকুর।

এইরূপে নানা উপায়ে অত্যন্ত সাবধানে রমেশ এই বালিকার যেটুকু জীবনবৃত্তান্ত আবিষ্কার করিল তাহাতে বড়ো-একটা সুবিধা হইল না।

তাহার পরে রমেশ কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল। খুব সম্ভব, ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে। যদি-বা শ্বশুরবাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ। মামার বাড়ি পাঠাইতে গেলেও ইহার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হইবে না। এতকাল বধূভাবে অন্যের বাড়িতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে সমাজে ইহার কী গতি হইবে, কোথায় ইহার স্থান হইবে? স্বামী যদি বাঁচিয়াই থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে? এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।

ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনোরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী

বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না। রমেশ এই বালিকাটিকে ভবিষ্যতের পটে নানা বর্ণের স্নেহসিক্ত তুলি দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে হইল।

রমেশ আর তাহার গ্রামে থাকিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকের ভিড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া একটা কিছু উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া রমেশ কমলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে দূরে নূতন এক বাসা ভাড়া করিল।

কলিকাতা দেখিবার জন্য কমলার আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রথম দিন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জানলায় গিয়া বসিল—সেখান হইতে জনস্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহে তাহার মনকে নূতন নূতন কৌতূহলে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। ঘরে একজন ঝি ছিল, কলিকাতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুরাতন। সে বালিকার বিস্ময়কে নিরর্থক মূঢ়তা জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "হাঁগা, হাঁ করিয়া কী দেখিতেছ? বেলা যে অনেক হইল, চান করিবে না?"

ঝি দিনের বেলায় কাজ করিয়া রাত্রে বাড়ি চলিয়া যাইবে। রাত্রে থাকিবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। রমেশ ভাবিতে লাগিল, 'কমলাকে এখন তো এক শয্যায় আর রাখিতে পারি না—অপরিচিত জায়গায় সে বালিকা একলাই বা কী করিয়া রাত কাটাইবে?'

রাত্রে আহারের পর ঝি চলিয়া গেল। রমেশ কমলাকে তাহার বিছানা দেখাইয়া কহিল, "তুমি শোও, আমার এই বই পড়া হইলে আমি পরে শুইব।"

এই বলিয়া রমেশ একখানা বই খুলিয়া পড়িবার ভান করিল, শ্রান্ত কমলার ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিল। পররাত্রেও রমেশ কোনো ছলে কমলাকে একলা বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সেদিন বড়ো গরম ছিল। শোবার ঘরের সামনে একটুখানি খোলা ছাদ আছে, সেইখানে একটা শতরঞ্জি পাতিয়া রমেশ শয়ন করিল এবং নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ও হাতপাখার বাতাস খাইতে খাইতে গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-তিনটার সময় আধঘুমে রমেশ অনুভব করিল, সে একলা শুইয়া নয় এবং তাহার পাশে আস্তে আস্তে একটি হাতপাখা চলিতেছে। রমেশ ঘুমের ঘোরে পার্শ্ববর্তিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া বিজড়িতস্বরে কহিল, "সুশীলা, তুমি ঘুমাও, আমাকে পাখা করিতে হইবে না।" অন্ধকারভীরু কমলা রমেশের বাহুপাশে তাহার বক্ষপট আশ্রয় করিয়া আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের বেলায় রমেশ জাগিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল নিদ্রিত কমলার ডান হাতখানি তাহার কণ্ঠে জড়ানো— সে দিব্য অসংকোচে রমেশের 'পরে আপন

বিশ্বস্ত অধিকার বিস্তার করিয়া তাহার বক্ষে লগ্ন হইয়া আছে। নিদ্রিত বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রমেশের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এই সংশয়হীন কোমল বাহুপাশ সে কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবে? রাত্রে বালিকা যে কখন এক সময় তাহার পাশে আসিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে বাতাস করিতেছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িল— দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বালিকার বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া রমেশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

অনেক চিন্তা করিয়া রমেশ বালিকাবিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে কমলাকে রাখা স্থির করিয়াছে। তাহা হইলে এখনকার মতো অন্তত কিছুকাল সে ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পায়।

রমেশ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা, তুমি পড়াশুনা করিবে?"

কমলা রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।— ভাবটা এই যে, 'তুমি কী বল?'

রমেশ লেখাপড়ার উপকারিতা ও আনন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না, কমলা কহিল, "আমাকে পড়াশুনা শেখাও।"

রমেশ কহিল, "তাহা হইলে তোমাকে ইস্কুলে যাইতে হইবে।"

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "ইস্কুলে? এতবড়ো মেয়ে হইয়া আমি ইস্কুলে যাইব?"

কমলার এই বয়োমর্যাদার অভিমানে রমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমার চেয়েও অনেক বড়ো মেয়ে ইস্কুলে যায়।"

কমলা তাহার পরে আর কিছু বলিল না, গাড়ি করিয়া একদিন রমেশের সঙ্গে ইস্কুলে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি— তাহার চেয়ে অনেক বড়ো এবং ছোটো কত যে মেয়ে, তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে, কমলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রমেশ কহিল, "কোথায় আসিতেছ? তোমাকে যে এইখানে থাকিতে হইবে।"

কমলা ভীতকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখানে থাকিবে না?"

রমেশ। আমি তো এখানে থাকিতে পারি না।

কমলা রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তবে আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে লইয়া চলো।"

রমেশ হাত ছাড়াইয়া কহিল, "ছি কমলা!"

এই ধিক্কারে কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানি একেবারে ছোটো হইয়া গেল। রমেশ ব্যথিতচিত্তে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, কিন্তু বালিকার সেই স্তম্ভিত অসহায় ভীত মুখশ্রী তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল।